Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-I, October 2024, Page No.18-30
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজনৈতিক পরিকাঠামো

শ্রী গেয়ান্ত চাকমা
অতিথি প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ, সাব্রুম দক্ষিণ ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:
In the history of ancient India, political groups rose due to their talent, military skills, diplomacy, autocracy and aggressive policies, and fell due to their internal turmoil, wars and poor governance. After the fall of the mauryan Empire in India, another powerful emerged the Gupta dynasty. Which is termed as the second Maurya Empire among historians. Chandragupta Maurya ll was one of the most talented king of the maurya Empire who succeeded his father Samudragupta. He was an efficient ruler and during his reign he showed despotism along with one of the expansion of the kingdom and welfare works. In addition to the accounts of his reign by native historians, the Chinese traveler Fa-Hien gave valuable information about his reign. After his ascension to the throne came coinage, art, architectural monuments and Central administration, military genius, judicial system, directive of the council of ministers, conquest of states, establishment of cities and Port as well as foreign ports and extensive promotion of his trade. He is a great empire although unable to conquest, he conquered some Kingdoms like Bengal and Vahlika.

Keywords: Gupta; Archaeologist; Empire; Latika; Legend; Immediate acceptance; Vikramaditya; Shakari; Navratna; Treaty etc.

সূচনা: মাতা রানী গিরিকা এবং চেদির কুরু রাজা উপরিচর বসুর পঞ্চম জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃহদ্রথ। তিনি মৌর্য বংশের সর্বশেষ নবম রাজা ছিলেন। কুচকাওয়াজে শক্তি প্রদর্শনের সময় তার প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। ভারত ইতিহাসে মৌর্য বংশের পতনের পর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতার সুযোগে বিদেশি শক্তির উত্থান হতে থাকে। এই বিদেশী শক্তির গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কুষাণরা। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে কুষাণ সাম্রাজ্যে ভারতীয় রাজনৈতিক অংশ থেকে অবসানের পর উত্তর ভারতে এবং অন্যান্য স্থানে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন উত্তর ভারতে এক বৃহৎ অংশে কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজতান্ত্রিক এবং প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যের আবির্ভাব গড়তে থাকে। রাজতান্ত্রিক রাজ্যগুলির মধ্যে:- কোশাম্বি অঞ্চলে 'মেঘ' বা 'মাঘ' বংশের উদ্ভব(১৩০ খ্রিঃ), অযোধ্যা অঞ্চলে 'মিত্র' রাজবংশীর উত্থান, যমুনা উপত্যকায় নাগ বংশের স্বাধীন রাজ্য স্থাপনএবং গোয়ালিয়র, রোহিলখন্ড এবং প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলির মধ্যে যৌধেয় গণ রাজ্য (১৭৫ খ্রিঃ), অর্জুনায়ানগণ রাজপুতানার আলোয়ার ও ভরতপুর অঞ্চলে। তাছাড়াও উপজাতীয় প্রজাতন্ত্র লিচ্ছবি, শক, সনকানিক, খরপারিক, প্রাজরুন প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠী। অন্যদিকে পূর্ব

ভারতে বাংলায় সমতট, দেবাক, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কামরূপ, কর্তৃপুর বা কুমায়ূন বা কাংড়া অঞ্চলের উপজাতি গোষ্ঠীগণ।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যবর্তী ও শেষাংশে (২৪০-২৮০ খ্রিঃ) শ্রীগুপ্ত এবং চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে গুপ্তদের নেতৃত্বে মগধকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয়বার আরো একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তাই একে কেউ কেউ গুপ্ত সাম্রাজ্যকে দ্বিতীয় মগধ সাম্রাজ্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আয়তনে গুপ্ত সাম্রাজ্যে যদিও মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় কিছুটা ছোট ছিল, কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় গুপ্ত সাম্রাজ্য বেশিদিন টিকে ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের ফলে দেশের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর হয় এবং শান্তি, শৃঙ্খলা পূর্বতন মৌর্যদের মতো ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। গুপ্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি-সামাজিক রীতিনীতি, স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট অগ্রগতি দেখা দেয়। তাই গুপ্ত যুগকে ভারত ইতিহাসে এক অতি গৌরবময় যুগ বলা হয়। ধর্মের দিক থেকে গুপ্ত বংশীরা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। 'বহিরঙ্গ' এবং 'অন্তরঙ্গ' উভই দিকেই বৈষ্ণব ধর্মে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এ যুগে অবতার পূজা সমসাময়িক সাহিত্য ও অন্যান্য লেখ থেকে জানা যায়। তার মধ্যে অন্যতম অবতার দশরথী রামের পূজা তখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। রঘুবংশমে উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা, বকাটক মহিষী প্রভাবতী গুপ্তও স্বয়ং দশরথী রামের উপাসিকা ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের পেছনে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার কাজ করেছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তখন 'পরম ভাগবত' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। এরপর থেকে তার উত্তরসূরিরাও এই রীতি অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। গুপ্ত যুগে রাজসভার ভাষা হিসেবে প্রাকৃতের পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার দেখা দেয় এবং পরবর্তীকালে এই সংস্কৃত ভাষাই ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাহন হতে পেরেছিল। ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ এই গুপ্ত শাসনব্যবস্থাকে 'সাম্রাজ্রিক' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এদের মধ্যে এস.আর.গয়াল এর নাম উল্লেখযোগ্য। আবার তাদের মধ্যে অনেকে একমত নন। ডঃ রোমিলা থাপার মনে করেন সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্র কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা এবং গুপ্ত শাসন ব্যবস্থায় এর বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অক্ষুন্ন ছিল না। ডঃ রমিলা থাপার ভৌগোলিক সীমানার দিক থেকে বিচার করলে একে সাম্রাজ্যিক বলা চলে কিন্তু শাসন কাঠামোর দিক থেকে বিচার করলে একে সাম্রাজ্যিক বলা বাঞ্ছনীয় নয়।

১) গুপ্ত বংশের উৎপত্তি: গুপ্ত বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক যথা এস.আর.গয়াল, পি.এল.গুপ্ত প্রমুখ, এদের মতে গাঙ্গেয় উপত্যকা বিশেষ করে এলাহাবাদ, সারনাথ তথা উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশকে বুঝিয়েছেন। অন্য এক শ্রেণী ঐতিহাসিকদের মধ্যে পূর্ব ভারতের, বিশেষ করে বাংলার মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা এবং বিহারের মগধকে চিহ্নিত করেছেন। এই শ্রেণীর পন্ডিতদের মধ্যে হলেন জন.অ্যালান, ডি.সি গাঙ্গুলী, আর.সি.মজুমদার, সুধাকর চট্টোপাধ্যায় এ.কে মজুমদার প্রমুখ। কে.পি.জয়সওয়াল,বৈয়াকরনিক চন্দ্রগোমিনের দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে বলেন, গুপ্ত সম্রাটরা ছিলেন জাঠ বংশীয়। আবার কোন কোন পন্ডিতরা মনে করেন, গুপ্ত সম্রাট ছিলেন 'ধারণ' গোত্রের লোক। এই ধারণ গোত্র ধারী'র শুদ্ধ সংস্কৃত নাম। পাঞ্চোভ তাম্রলিপিতে গুপ্তরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করতেন। গুপ্ত বংশের সঙ্গে রাজবংশের যে বিবাহ সম্পর্কিত স্থাপিত হয়েছে, তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে লিচ্ছবি বাকাটক বা নাগ বংশের তাঁরা ব্রাহ্মণ নয় তাঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। আবার কেউ কেউ বলেন গুপ্তরা ব্রাহ্মণ্য- বৈশ্যবর্ণের লোক ছিলেন। ডঃ এইচ.সি.রায় চৌধুরী বলেছেন যে গুপ্তদের গোত্র ছিল 'ধারণ'। ব্রাহ্মণ বংশীয় শুঙ্গ রাজা অগ্নিমিত্রের পত্নী ধারিণীর সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল। ফলে গুপ্ত ব্রাহ্মণ হতে

পারেন বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ডঃ পি.এল.গুপ্ত এই মত সমালোচনা করে বলেন শুঙ্গ যোগের রাণী ধারিণীর সঙ্গে গুপ্তদের ব্যবধান বহু শতকের। ডঃ গয়াল এর মতে গুপ্ত সম্রাটরা ব্রাহ্মণ বংশ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন-১) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তের বিবাহ হয় রুদ্রসেন বাকাটকের সঙ্গে। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। ২) নরসিংহ গুপ্ত তাঁর ভগ্নিকে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দেন। তবে এটি ছিল পরোক্ষ প্রমাণ। অন্যদিকে গুপ্তরা নিজেদেরকে স্বয়ং ক্ষত্রিয় বলে দাবি করতেন। ডঃ রামশরণ শর্মা বলেছিলেন, ধর্মশাস্ত্র গুলিতে নানান বর্ণের ক্ষেত্রে নানান উপাধি রয়েছে। এদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণদের উপাধি ছিল শর্মণ, ক্ষত্রিয়দের উপাধি ছিল বর্মণ, বৈশ্যদের উপাধি ছিল গুপ্ত এবং শূদ্রদের উপাধি ছিল দাস।

২) গুপ্তদের আদি বাসস্থান: গুপ্তদের আদি বাসস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। লেখমালা ও মুদ্রা থেকে পাওয়া যায়, প্রথম এক শতাব্দী ধরে গুপ্তরা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অক্ষুন্ন রেখেছিল এবং পরবর্তী তৃতীয় শতাব্দীর শেষে গুপ্তদের আদি সাম্রাজ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে। গুপ্তযুগের প্রাচীন নিদর্শন গুলি বিচারে উত্তরপ্রদেশে ছিল এই সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। সুতরাং এর থেকে মনে করা হয় উত্তরপ্রদেশ থেকে গুপ্ত রাজারা তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন এবং বিভিন্ন দিকে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতেন। 'প্রয়াগ' হল গুপ্তদের শক্তির কেন্দ্রস্থল এবং সেখান থেকে ক্রমশ গুপ্তরা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করতেন। আবার অনেকেই সমতট বা পূর্ব বাংলা ছিল সমুদ্র গুপ্তের সাম্রাজ্যের পূর্বসীমা বলেছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং এর বিবরণের উপর ভিত্তি করে ডঃ ডি.সি.গাঙ্গুলী ও ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন গুপ্তদের আদি বাসস্থান ছিল নালন্দার পূর্বদিকে ভূমি অর্থাৎ বাংলার বরেন্দ্রভূমি।

এতে বিষ্ণুপুরাণ, বায়ু পুরাণ ও ভাগবত পুরাণ এর উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো মগধকে তাদের আদি বাসস্থান বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে ডঃ এস.আর. গয়াল বলেছেন- গুপ্ত রাজাদের অধিকাংশ মুদ্রায় উত্তরপ্রদেশে পাওয়া গেছে - যা বাংলা বা মগধের মিলেছে। এই কারণে গুপ্তদের আদি বাসস্থান হল উত্তরপ্রদেশে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তবে এ সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

গুপ্ত বংশের সাম্রাজ্য স্থাপনকারীর তালিকা :

১) মহারাজা শ্রীগুপ্ত (২৪০-২৮০ খ্রিঃ).

২) মহারাজা ঘটোৎকচ গুপ্ত (২৮০-৩১৯ খ্রিঃ)

↓

৩) মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত- কুমার দেবী (লিচ্ছবি রাজকুমারী) (৩১৯-৩৩৫ খ্রিঃ)

↓

৪) সমুদ্রগুপ্ত- রানী দত্তা দেবী (৩৩৫-৩৮০খ্রীঃ)

↓

৫) রামগুপ্ত

৬) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-রানী ধ্রুবদেবী (৩৭৫-৪১৫ খ্রিঃ

↓

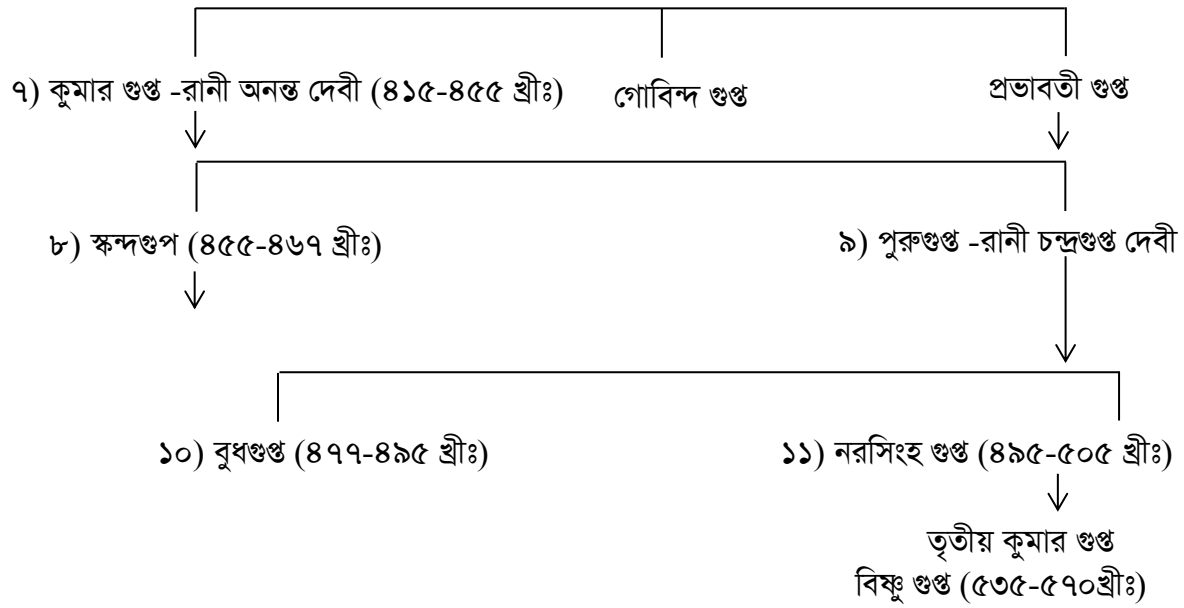

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপাদান (The sources for the study of the history of about Chandra Gupta- II): গুপ্ত যুগের ঐতিহাসিক উপাদান সম্পর্কে অনেকগুলি দেখা দেয়। উপাদানগুলি মূলত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন:-১) লেখ, ২) মুদ্রা , ৩) সাহিত্য,৪) দেশীয় বিবরণ, এবং ৫) বৈদেশিক বিবরণী থেকেও জানা যায়।

৩) শিলা লিপি: গুপ্ত যুগের প্রায় ৪২ টি সিললিপি পাওয়া গেছে। এগুলি গুপ্ত যুগের ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে ২৭টি পাওয়া গেছে পাহাড়,স্তম্ভ ও মূর্তির গায়ে এবং ২৭ টি লেখার মধ্যে ভাইজতি লেখ বেসরকারি, একটি সরকারের দানপত্র, দুটি স্কন্দগুপ্তের প্রশস্তি এবং অন্য দুটি সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি। ১৪ টি তাম্রশাসন, তিনটি রাজকীয় জমি দানপত্র এবং দশটি ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে ভূমিদানের জন্য সরকারের জমি বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য জানা যায়। এই ৪২ টির মধ্যে একটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে লৌহ স্তম্ভ জানা যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সম্পর্কে "মথুরা লিপি" এক অতি গুরুত্বপূর্ণ । 'এরণ শিলালিপি' থেকে জানা যায় যে, পিতা সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তাঁর মাতা ছিলেন দত্তাদেবী। 'এরাণ' শিলালিপিতে বলা হয়েছে তিনি নরেন্দ্রচন্দ্র, সিংহচন্দ্র, নরেন্দ্রসিংহ, সিংহবিক্রম, দেবরাজ, দেবশ্রী প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও উদয়গিরির দুটি স্তম্ভ লেখ; (তারিখবিহীন উদয়গিরি শিলালেখ, গুপ্ত বর্ষ ৮২ অর্থ্যাৎ ৪০২ খ্রিষ্টাব্দ) এবং সাঁচি লিপি, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে আরো গাদওয়ানা শিলালিপি এবং দিল্লির কুতুবমিনারের কাছে প্রাপ্ত মেহরৌলী লৌহ স্তম্ভ লেখ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের জন্য খুবই উল্লেখযোগ্য। এই মেহরৌলী লৌহ স্তম্ভে চন্দ্রগুপ্তের বঙ্গ রাজ্য জয় সম্পর্কে উল্লেখ আছে এবং আরো সপ্তঙ্গ সিন্ধু প্রদেশে বালির রাজ্যের জয় সম্পর্কে জানা যায়। তিনি দক্ষিণাঞ্চলে তার রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে এক খ্যাতি লাভ করেন। দিল্লির মেহরৌলী লৌহস্তম্ভে চন্দ্র রাজার লিপিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্পর্কিত বলে অনেকে মনে করেন।

৪) সীলমোহর: সীলমোহরগুলি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়। এই সীলমোহরগুলি বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার সম্পর্কে এবং বিচার ব্যবস্থার সম্পর্কে নানান তথ্য পাওয়া যায়। ব্লচ এর বেসারা'র খননকার্যে প্রাপ্ত দীর্ঘ কাদামাটির শীলমোহরগুলিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্পর্কে নিখুঁত তথ্য পাওয়া যায়। এই সীলমোহর গুলিতে গোবিন্দ গুপ্তের মা ছিলেন ধ্রুবদেবী যা মহানদেবী বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। একথা উল্লেখ করা যায় যে, একদায় গোবিন্দ গুপ্ত তার পিতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলের তীরুবর্তী অঞ্চলে গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এতে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যেমন- উপারীকা, মহাদন্ধনায়ক, বালাধীকর্ণ, কুমারমাত্য, রানাবন্দাধীকর্ণ, দন্ধাধীকর্ণ, মহাপ্রতিহার, বিনয়াসুর, তলবানা ইত্যাদি। বৈশালীর মুজাফফরপুর জেলার সীলমোহর গুলির মধ্যে অন্যতম। এই সীলমোহরগুলিতে উল্লেখ আছে ধ্রুবদেবী ছিলেন চন্দ্র গুপ্তের রানী। তিনি প্রথম কুমার গুপ্তের ভ্রাতা মহারাজ গোবিন্দ গুপ্ত মাতা ছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে প্রচলিত মুদ্রা সমূহ:

ছত্র প্রকৃতি

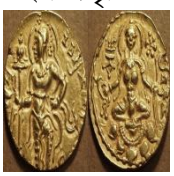

তীরন্দাজ প্রকৃতি

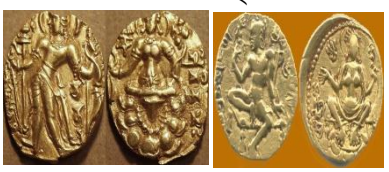

পালঙ্ক প্রকৃতি

রাজদন্ড প্রকৃতি

সিংহ হত্যাকারী প্রকৃতি

ঘোড়সওয়ার প্রকৃতি

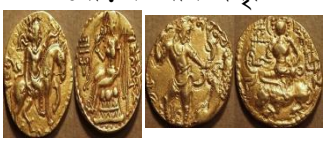

৫) মুদ্রা: চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা গুলি থেকে এক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়। এই মুদ্রা গুলি বিভিন্ন প্রকৃতির দেখা যায় যেমন তীরন্দাজ, পালঙ্ক, ছত্র বা ছাতা প্রকৃতি, সিংহ-অপহন্তার প্রকৃতি, ঘোড়সওয়ার প্রকৃতি, সাধারণ রুপা, তামা ও সীসা ইত্যাদি। এল্যান গুপ্ত মুদ্রাগুলিকে কালানুক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে তোলার একটি টিকা তৈরি করেন। গুপ্ত যুগের মুদ্রা গুলি মূলত সোনা, রুপা এবং তামা ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সর্বপ্রথম রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, তার রাজত্বকালে শেষদিকে প্রথম পশ্চিম ভারত ও মালবের শকদের অনুকরণে এই রৌপ্য ও মুদ্রা প্রবর্তন ঘটিয়েছিলেন। এখানে আবার অনেকে অনুমান করেছেন যে, শক যুদ্ধের জয়লাভ করে তিনি এই মুদ্রা প্রচলন করেন। কারণ এতে শকদের প্রতীক চিহ্ন চৈত্য এবং অর্দ্ধচন্দ্র আছে। এই মুদ্রা গুলি সব সময় একই রকম ছিল না এবং ওজনের পরিমাণও তা ব্যতিক্রম নয়। গুপ্ত শাসকদের আমলে ১১৮ গ্রেন থেকে শুরু করে ১৫১ গ্রেণ পর্যন্ত স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের স্বর্ণ মুদ্রা গুলি ওজন ছিল ১২১ থেকে ১২৮ গ্রেণ ছিল। প্রথম কুমার গুপ্ত , স্কন্দ গুপ্ত ও পরবর্তীকালে বুধগুপ্ত ও এই রৌপ্য-মুদ্রা প্রচলন বজায় রেখেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ১১ টি তাম্র মুদ্রাও পাওয়া গেছে প্রাচীন পাটলিপুত্রে কুমরহার এবং রাজগীর এ ও একটি পাওয়া গেছে। আবার উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যা, অহিচ্ছত্রে এবং কৌশাম্বী এই মুদ্রা কয়েকটি পাওয়া গেছে। তাছাড়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুজরাট ও

কাথিয়াওয়াড়ের বিজিত প্রদেশ গুলিতে নতুন রৌপ্য মুদ্রা চালু করেছিলেন। গ্রীক রাজা মেনান্ডার এবং অ্যাপোলোডোটোসের রৌপ মুদ্রা খ্রিস্টীয় প্রথম এবং শেষের দিকের প্রচলন রীতিতে, তা পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে স্বর্ণ এবং পশ্চিম ভারতে তামার মুদ্রা স্থানীয়করণ জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ফলের মুদ্রা গুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। এটা বলা যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রৌপ্য মুদ্রা ছিল পশ্চিমা ক্ষত্রপাদের রাজার মাথার একটি ঘনিষ্ঠ অনুলিপি এবং অধঃপর্তিত গ্রিক কিংবদন্তির চিহ্ন সহ বিপরীত সংখ্যায় একটি তারিখ লেখা আছে। বিপরীতটি সিথিয়ান চৈত্য বা মেরু-এর জায়গায় বিস্তৃত ডানা সহ পালিত গরুড় স্থাপন করা হয়েছিল রাজকীয় গুপ্তদের পারিবারিক ক্রেষ্ট বা লাঞ্ছনা।

৬) স্মৃতিস্তম্ভ, ভাস্কর্য শিল্প-রীতি: গুপ্ত যুগে নানান স্থানে প্রচুর স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলো থেকে এই যুগের শিল্পের কথা জানা যায়। নালন্দা, মথুরা এবং বারাণসী হলো এই যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প কেন্দ্র। খননকার্যের ফলে সমস্ত নিদর্শন এই সময়ে মানুষের জীবনযাত্রা ধর্মীয় সম্পর্কে নানান তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়াও এই যুগে বিভিন্ন শিল্প রীতির ধ্বংসাবশেষ এবং দেওগড়ের আইহোল এবং ভিতারগাঁওয়ের মন্দির গুলির নানান তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও নানান উপবিষ্ট বৌদ্ধ মূর্তি, সারনাথের যাদুঘর ও শিল্পরীতি এবং পাটনাটে যাদুঘর সভা, নানান দেবতা যেমন- বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, জৈন তীর্থঙ্কর এবং উদয়গিরিতে বিষ্ণুয় উপাসনা। গঙ্গা-যমুনাতে নানান দেবদেবী এবং দেওঘরের শিব ও বিষ্ণুর নিবেদিত উপাসনা এবং অজন্তা ও ইলোরা গুহার চিত্রকলা গুপ্ত যুগের চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আরো উদয়গিরি শিলালেখটিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধীন সামন্ত সনকানিক মহারাজ কর্তৃক একটি বৈষ্ণব গুহা মন্দির নির্মাণের উল্লেখ এতে আছে। তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তারিখটি অর্থাৎ গুপ্তবর্ষ ৮২ বা ৪০২ খ্রিস্টাব্দ।

৭) সাহিত্যিক উপাদান: গুপ্ত যুগের সাহিত্য থেকে এই যুগের বহু তথ্য পাওয়া যায়। এই সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া তথ্য গুলি হল- ১) পুরানগুলি থেকে যেমন গুপ্ত বংশের তালিকা পাওয়া যায়, তেমনি বায়ু ,মৎস্য ,বিষ্ণু, ব্রহ্মান্ডপুরাণেও এ বিষয়েও বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। ২) সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী শিখন রচিত কামন্দক- নীতিসার গ্রন্থ থেকে গুপ্ত যুগের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন ও শাসনব্যবস্থার সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। বজ্জিকা নামে এক বিদুষী মহিলা কৌমুদী 'মহোৎসব' নামে এক নাটক রচনা করেন। এই নাটকে গুপ্ত যুগের গোড়ার দিকে রাজনীতি ইতিহাস জানা যায়। ৩) স্মৃতিশাস্ত্র- বিশেষত নারদ- স্মৃতি ও বৃহস্পতি- স্মৃতি থেকেও বহু তথ্য পাওয়া যায়। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, ভাস -এর স্বপ্নবাসবদত্তা ও চারুদত্ত, জ্যোতির্বিদ্যাভরণ এবং কথাসরিৎসাগর ও কালিদাস -এর অভিজ্ঞানশকুন্তলম, বিশাখদত্তের দেবিচন্দ্রগুপ্তম্ ও মুদ্রারাক্ষস এবং ভারবি-এর কিরাতার্জুনীয়ম্ নাটকে ও এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

৮) দেশীয় বিবরণ: ডি.ডি. কৌশাম্বী, ডঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, আর.সি.মজুমদার, প্রফেসর আর. দি.ব্যানার্জি প্রমুখ ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকেও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সম্পর্কে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়।

৯) বৈদেশিক বিবরন: চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে ভারতে আগমন করেন। তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের প্রায় পাঁচ বছর বাস করেছিলেন। চীনা বিবরণ থেকে জানা যায় যে ফা-হিয়েনের প্রকৃত নাম ছিল কুঙ্গ। তিনি ৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে শানসী প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর তার নামকরণ হয় ফা-হিয়েন। ফা হিয়েন কথার অর্থ হল 'বিনয়ের প্রতিমূর্তি'। ফা-

হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজনৈতিক সম্পর্কে বিস্তারিত না বললেও তাঁর যে ভারতবর্ষের অবস্থান , সাধারণ লোকের জীবন যাপন, পাটলিপুত্রের বর্ণনা, মধ্যপ্রদেশের জনগণের আচার-আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিয়েছিলেন। দীর্ঘ বছর পর ৬৫ বছর বয়সে চেংগান থেকে বৌদ্ধ ধর্মের উৎসস্থল ভারতবর্ষের দিকে রওনা হন। দীর্ঘ ১৪ বছর ভারতবর্ষে অবস্থানের পর সিংহল দ্বীপ ও যবদ্বীপ পরিভ্রমণের পর সমুদ্রের পথে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। তাঁর ভারতবর্ষে পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতায় 'ফো-কো- কিং' নামে একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারতবর্ষে অবস্থানকালীন বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করেন, এগুলির মধ্যে- মথুরা, কনৌজ, কপিলাবস্তু, বারাণসী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, গয়া, তাম্রলিপ্ত তিনি পরিদর্শন করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে ভারতবর্ষের লোক অনেক সুখে বাস করত। বাসগৃহগুলির নাম এবং নম্বর সরকারি খাতায় রেজিস্ট্রেশন করতে হতো না। তাদের জীবনযাত্রা ও দৈনন্দিন কাজের সরকারি কর্মচারীরা হাত দিত না। সাধারণ লোকেরা সরকারি সিতা জমি চাষ করার পর রাজাকে কিছু পরিমাণে অর্থ দিত। রাজদ্রোহদের অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা রয়েছে বলে বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যদিকে পাটলিপুত্রে তিনি প্রায় তিন বছর ছিলেন। পাটলিপুত্র ছিল মধ্যদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর। এখানে লোকেদের সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবনযাপন করত। তাছাড়া প্রজা কল্যাণের জন্য তিনি চিকিৎসালয়, নগর উন্নয়ন, দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ দান ও খাদ্য সামগ্রী দান, অনাথ আশ্রম এবং শিক্ষালয় প্রভৃতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে দেখা দেয়।

১০) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বংশ পরিচয়: সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং মাতা দত্তাদেবীর গর্ভজাত সন্তান। বিশাখদত্তের 'দেবীচন্দ্রগুপ্তম' নাটক থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন রামগুপ্ত। তার পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ছিলেন দুর্বল ও অযোগ্য শাসক। জৈনক শক রাজার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কলঙ্কজনক অবস্থায় একটি শর্তে সন্ধিতে স্বাক্ষর করে, তার মহিষী ধ্রুবদেবীকে সেই শক রাজার হস্তে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিলে ক্ষুব্দ কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শক রাজাসমেত এবং রামগুপ্তকে হত্যা করে ৩৭৫ খ্রীঃ(মথুরা ও সাঁচী লিপির স্বাক্ষ্য অনুসারে) তিনি সিংহাসনে বসেন এবং পরে ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন। অধুনা পন্ডিতেরা বিদিশা শিলালিপির প্রমাণ থেকে রামগুপ্তের কাহিনীর সত্যতা আছে বলে মনে করেন। তিনি 'এরাণ' শিলালিপি অনুসারে নরেন্দ্রচন্দ্র, সিংহচন্দ্র ,নরেন্দ্রসিংহ, সিংহবিক্রম, দেবরাজ,দেবশ্রী প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। আবার তার আরেকটি নাম হল দেবগুপ্ত। তার কন্যা ও বাকাটক বংশের রানী প্রভাবতী গুপ্তার শিলালেখ থেকে জানা যায়। তবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আগে রামগুপ্ত সিংহাসনে বসেছিল এটি কোন প্রমাণ নেই। এ ধারণার পক্ষে আরেকটি যুক্তি হলো এরাণ শিলালিপিতে 'তৎপরিগৃহীতা' শব্দটি।

১১) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বৈবাহিক সূত্র বন্ধন ও তাঁর ফল: রাজতান্ত্রিক যুগে বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু রাজা বা সম্রাটের একের অধিক বিবাহ সূত্র বন্ধন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেরও লক্ষণীয়। আবার অন্যদিকে বিধবা নারীরাও একের অধিক বিবাহে আবদ্ধ হতেন। "দেবী চন্দ্রগুপ্ত" এর বিশাখদত্তের লেখা ভোজা শ্রিং আরা প্রকাশ্যে একটি পান্ডুলিপিতে ছয়টি অনুচ্ছেদ পাওয়া যায়, রামগুপ্ত নামে একজন রাজা ছিল। তাঁর সময়ে শক রাজাদের সাথে প্রায়ই ঘাত-প্রতিঘাত চলতো। কোনো এক সময়ে এক শক রাজা তাঁর রাজ্যকে আক্রমণ করেছিল। তিনি মন্ত্রীর পরামর্শে শক শত্রুদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে যেতে রাজী ছিলেন না। ফলে যুদ্ধে না গিয়ে তাঁর পত্নী রানী ধ্রুবদেবীকে শক রাজার কাছে তুলে দিতে আশ্বাস দিলেন।

ফলে রামগুপ্তের ছোট ভাই 'কুমার' ঐ শক রাজাদের শিবিরে ধ্রুবদেবীর ছদ্মবেশে প্রবেশ করেন এবং শক রাজাকে হত্যা করে তাঁর শালিকাকে বিবাহ করেন। অপরদিকে বাণভট্রের "হর্ষচরিত"গ্রন্থে ও শঙ্করার্যের ভাষ্য গ্রন্থে এবং এগারো শতকের আবুল হাসান আলীর "মাজমান-উল-তাওয়ারীখ"এর একটি ফার্সি গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে রামগুপ্ত শক রাজাদের কাছে আক্রমণ শিকার হয়ে, তিনি তাঁর স্ত্রী ধ্রুবদেবীকে শক রাজার কাছে প্রেরণ করতে স্বীকার হয়েছিলেন এবং তিনি বলেন প্রজাদের কল্যাণ সাধনের জন্য এ কাজটি করবেন। অন্যদিকে তার স্ত্রী খুবই বিরোধ পোষণ করেন। এই পরিস্থিতিতে রামগুপ্তের ভ্রাতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পাগলাতে অবস্থায় হয়ে শক রাজাকে হত্যা করেন এবং পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগুপ্তকে হত্যা করে বিধবা পত্নী প্রথম স্ত্রী হিসেবে ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন। তবে একথা উল্লেখ করা যায় যে এই সময়ে রাজা রাম গুপ্তের কথা উল্লেখ নেই। কেননা তৎকালীন সময়ে শুধুমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে রাজাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন রাম গুপ্তের ভ্রাতা কুমার ধ্রুবদেবীর ছদ্মবেশে শক রাজাকে হত্যা করেন, আবার কেউ বলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শক রাজাকে ধ্রুবদেবীর ছদ্মবেশে হত্যা করেছিলেন। তবে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্বপক্ষের যুক্তি অনেক বেশি দেখা দেয়।

তবে এক্ষেত্রে প্রথম অমোঘবর্ষের সাঞ্জন প্লেটের বিবৃতি অনুসারে, নবম শতাব্দীতে বানার দুইশত বছর পরে রাম গুপ্তের পদত্যাগ ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাথে বিবাহ সম্পর্কে স্মরণ আছে। এতে ধ্রুবদেবীর দুটি সন্তান জন্ম নেয় কুমার গুপ্ত প্রথম এবং গোবিন্দগুপ্ত নাম উল্লেখ ছিল।

ড: ভিনসেন্ট স্মিথ ও ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রভৃতি ঐতিহাসিক বলেছেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তার বিবাহ নীতিকে সম্প্রসারণ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। ডঃ রায়চৌধুরীর মতে, "গুপ্তবংশের বৈদেশিক নীতিতে বিবাহ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল।" তিনি নাগ বংশীয় রাজকন্যা তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে কুবের নাগকে বিবাহ করেন। কুবের নাগের গর্ভজাত কন্যা প্রভাবতী গুপ্তকে তিনি বাকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে বিবাহ দেন। এছাড়া কুন্তল বা কর্ণাটক দেশের কদম্ববংশের বর্মনের রাজকন্যাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তার পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন বলে কদম্বলিপি থেকে জানা যায়।

এই বিবাহ নীতির ফল সম্পর্কে ডঃ স্মিথ বলেছেন, নাগ ও বাকাটক বংশের মিত্রতা চন্দ্রগুপ্তের শক যুদ্ধের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। প্রথমত:-পশ্চিম ভারতে শক শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করতে হলে মধ্যপ্রদেশের নাগ শক্তি ও দাক্ষিণাত্যের বাকাটক শক্তির সমর্থন ছাড়া সফল হওয়া সম্ভব নয়। অপরদিকে গুপ্ত সম্রাটের বিরুদ্ধে বাকাটকরা কোনরূপ বাধা না দেওয়ায় চন্দ্রগুপ্ত শকদের সহজে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয়ত:- বাকাটক মৈত্রী থাকার ফলে ভবিষ্যতের শক শক্তির পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত:- প্রভাবতী গুপ্তের স্বামী দ্বিতীয় রুদ্রসেন বাকাটক স্বল্পকালের মধ্যে দেহত্যাগ করলে প্রভাবতীই তাঁর নাবালক পুত্রদের পক্ষে বাকাটক রাজ্যর শাসিকায় পরিণত হন। তার মাধ্যমে বাকাটক রাজ্য গুপ্তদের প্রভাব বেড়েছিল। অপরদিকে ডঃ গয়াল একমত নয়। তাঁর মতে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যখন শক যুদ্ধে ব্যাপৃত হন তখন বাকাটকদের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায়। বাকাটক বিবাহের বহু পরে চন্দ্রগুপ্ত শক অভিযান করেন। সকল দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, বাকাটক বিবাহের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের লাভ হয়েছিল। ডঃ স্মিথের মতে, শক যুদ্ধের জন্য কুন্তল রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা ও গুপ্তদের শক্তি বাড়ায়।

১২) কেন্দ্রীয় প্রশাসন: প্রশাসনের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ প্রাচীন কর্তৃপক্ষ, যেমন- মনু, নারদ, বৃহস্পতি, কৌটিল্য, কামন্ডক, শুক্র। তাঁর রাজ্যের মধ্যে সাতটি উপাদানের সম্বন্ধে গঠিত। যেমন স্বামীন (শাসক বা

সার্বভৌম), অমাত্য (মন্ত্রী), জনপদ (রাজ্য বা রাজধানী), কোষা (কোসাগার) দন্ড (সেনা) মিত্র (সহযোগী)। এগুলি হল রাষ্ট্রের অঙ্গ।

১৩) রাজা: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে রাজা ছিলেন সর্বেসর্বা এবং তার অধীনে অন্যান্য মন্ত্রী বর্গরা রাজকার্য সম্পাদন করতেন। তিনি ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্তা। সেই কারণে জনগণের সুখ- দুঃখ ইত্যাদির জন্য জন কল্যাণকর কাজে তিনি অগ্রনীয় ভূমিকা পালন করতেন। গুপ্ত যুগে রাজারা তাদের সামরিক বিজয়ের ফলে যেমন- সমুদ্র গুপ্ত, কুমার গুপ্ত, স্কন্দ গুপ্তের মত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকেও ভালো নাম গুলি চার মহাসাগরের জল দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল।

১৪) সামরিক প্রতিভা: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতা সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় সামরিক প্রতিভার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তিনি পিতা সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী হিসেবে এক বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেন। তবে কেবলমাত্র ঐ সাম্রাজ্য লাভ করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এর পরিধি কিছুটা বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি অবশ্যই পিতার মতো বহু দূর-দিগন্ত পর্যন্ত তিনি রাজ্যের বিস্তার ঘটাননি। তাঁর ন্যায় বহুসংখ্যক যুদ্ধে তাঁকে লিপ্ত হতেও হয়নি। সাহিত্যিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি থেকে সে ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এখানে উল্লেখ করা যায় যে, তিনি প্রথমে পৈত্রিক সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় এবং এর সীমান্তকে সুরক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরে তিনি রাজ্য জয় তথা যুদ্ধ অভিযানের ব্রতী হন।

১৫) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অনেকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তার মধ্যে সনকানিকা প্রধান। তিনি একজন মহারাজা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা ছিলেন। উদয়গিরি গুহার শিলালিপির বীরসেন সাবা নামে একজন অন্যতম একজন রাজপুত্র সচিব বা মন্ত্রী ছিলেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পদ লাভ করেন। বীরসেন সাবা পাটলিপুত্র থেকে উদয়গিরি পর্যন্ত যেতেন। করমদন্ডতে ১১৭ সালে আরেকটি মন্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। সিখরস্বমিন নামে একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী, যিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি কুমারমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আরো অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী গুলি পূর্বের সিলমোহরে উল্লেখিত। গুপ্ত যুগে মন্ত্রী পরিষদ ছিল কিনা তা বলা যায় না, কিন্তু কামন্দকার নীতিসারায় মন্ত্রিপরিষদের বিষয়ে কিছু ইতিবাচক লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রিপরিষদকে মনু 'বারো' বলেছেন বৃহস্পতি 'ষোল' বলেছেন।

১৬) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য জয়: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর পিতার রাজ্যসীমা মোটামুটি অক্ষুন্নভাবে লাভ করে। সমতট বা পূর্ব বাংলা ছিল সমুদ্র গুপ্তের সাম্রাজ্যের পূর্বসীমা। কামরূপের রাজারা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সার্বভৌমত্ব সম্ভবত মেনে নিয়েছেন। মথুরাও সমুদ্রগুপ্তের অধীন ছিল । মথুরাই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শিলালিপি থেকে পাওয়া গেছে। সুতরাং এই অঞ্চল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধীন ছিল কিনা তা সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত রাজ্য কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপ থেকে পূর্ব বাংলা সীমানা এবং হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য পরিণত হয়। বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পূর্ব পাঞ্জাবের উপজাতি রাজারা সমুদ্রগুপ্তের আমলের মতই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য মেনে নেন বলা যায়। পাঞ্জাবের অপর অংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য ছিল কিনা তা বলা যায় না। মালব, গুজরাট ও সুরাষ্ট্র রাজত্বকারী বিদেশি শকদের পরাজিত ও বিতাড়িত করা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তবে এক্ষেত্রে কোন প্রমাণ তথ্য পাওয়া না গেলেও ডঃ পি.এল.গুপ্ত তিনি বলেছিলেন গুপ্ত রাজাদের দেওয়া প্রমাণ ও শক রাজাদের দেওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে এই রাজ্য জয়ের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উদয়গিরি গুহার শিলালিপিতে

বীরসেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিক্রমাদিত্যের সান্ধিবিগ্রহীক ছিলেন। সন্ধি বলতে এক ধরনের চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে যার ফলে বিবদমান দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। বিগ্রহ মানে হলো যুদ্ধ অর্থাৎ যে রাজা শান্তি এবং বিদ্রোহের কাজে নিযুক্ত তাকে সন্ধিবিগ্রহীক বলা হয়। তিনি পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যখন পশ্চিমা ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন, তখন বীরসেন তাঁর আনুগত্য ছিলেন।

১৭) বঙ্গ ও বাহ্লীক জয়: মেহেরৌলি লৌহ স্তম্ভ লিপিতে দিল্লির কুতুব মিনারের কাছে মেহেরৌলি গ্রামে একটি লৌহ স্তম্ভে উৎকীর্ণ তারিখবিহীন লিপি দেখে জানা যায় যে, 'চন্দ্র' নামে জৈনক রাজা বঙ্গের নৃপতিবর্গের এক সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করে বাহ্লীক দেশ জয় করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে 'চন্দ্র' ও 'দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত' তিনি একই ব্যক্তি। সম্ভবত সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুনরায় তা জয় করেন। বাহ্লীক বলতে অনেকে ব্যাকট্রিয়া বলে মনে করেন। তবে এখানে বলা বাহুল্য, তাঁর পক্ষে ব্যাকট্রিয়া জয় করা অসম্ভব ছিল। ঐতিহাসিক এ্যালান-এর মতে, বাহ্লীক বলতে সিন্ধু নদ ও পাঞ্জাবকে বোঝানো হয়েছে এবং বাহ্লীক বলতে এই যুগে দুই অঞ্চলকে বোঝাত। ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর মতে, এখানে সিন্ধু নদ অঞ্চলের উপজাতিদেরকেই বলা হয়েছে।

১৮) শক যুদ্ধে জয়লাভ: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য জয় সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শকদের পরাস্ত। শকদের জয় করা সম্পর্কে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের তার কোন শিলালিপিতে উল্লেখ না থাকলেও এক্ষেত্রে কয়েকজন ঐতিহাসিকদের তথ্য অনুযায়ী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শক যুদ্ধের জয় লাভের কথা উল্লেখ করা যায়। ডঃ পি.এল. গুপ্ত তিনি (পূর্বে উল্লেখিত) শক রাজাদের এবং গুপ্তর রাজাদের দেওয়া এর দুই পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শক যুদ্ধে জয়লাভ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এই প্রমাণগুলি উল্লেখ করা যায় যে- ১) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেনের উদয়গিরি শিলালেখ, ২) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সেনাপতি আম্রকর্দ্দবের সাঁচি লিপি, ৩) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রৌপ্যমুদ্রাতে গুপ্ত বংশের চিরাচরিত "ময়ূর" প্রতীকের স্থলে শব্দের অনুকরণে চৈত্য, অর্ধচন্দ্র ও তারকা চিহ্ন খোদাই করা আছে। তারিখ ও সনবিহীন, উদয়গিরি সীলালিপিতে বীরসেন যখন তার প্রভু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে উদয়গিরি যান তখন তিনি পৃথিবীর জয়ের চেষ্টারতের উল্লেখ। ৪১২-৪১৩ খ্রীঃ সাঁচিলিপিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সেনাপতি "বহু যুদ্ধজয়ের" কথা উল্লেখ আছে। এছাড়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামন্ত সনকানিক মহারাজার ৪০১-৪০২ খ্রিস্টাব্দ একটি ভূমিদানপত্রও উদয়গিরিতে পাওয়া গেছে। অন্য দিকে ডঃ গয়াল বলেছেন পশ্চিম উপকূলে গুজরাট বন্দর থেকে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের পথ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তিনি শক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। শক রাজা তৃতীয় রুদ্রসেন বা রুদ্র সিংহ যুদ্ধে নিহত হন এবং শক রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে প্রধান শহর - নগর: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে পাটলিপুত্র ছিল এর রাজধানী। সম্ভবত ৪০২ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বাসভূমি মালোয়ার বিদিশাতে অবস্থিত এবং পরবর্তীকালে উজ্জয়িনীতে স্থানান্তর করা হয়। তিনি ছিলেন উজ্জয়িনী এবং পাটলিপুত্রের শাসনকর্তা। বসুবন্ধের মতে অযোধ্যা ছিলেন বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। এ্যালান-এর মতে, অযোধ্যা নগরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে তামার প্রচলন দেখা যায়।

২০) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বন্দর সমূহ: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের আমলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর গড়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে মালাভা প্রদেশ, কাথিয়াওয়াড়, উত্তর গুজরাট, কাম্বের বিখ্যাত বন্দর-ঘোঘা, ভেরাওয়াল, পোরবন্দর এবং দ্বারকা। পশ্চিম সীমান্তের এই সম্প্রসারণের প্রভাব ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশা-পাশি উত্তর ভারতে বহু সংস্কৃতিতেও ব্যাপক ছিল। গুজরাতের কাথিওয়াড় বন্দর জয়ের ফলে ইউরোপীয় এবং আফ্রিকান বাণিজ্যের ব্যাপক প্ররোচনা আসে।

২১) মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভ: মেহেরৌলি লৌহ স্তম্ভে লেখতে রাজা চন্দ্র কে বেশিরভাগ পন্ডিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলে মনে করেছেন। এদের মধ্যে প্রথম মত পোষণ করেছেন পন্ডিত প্রবর এ.এফ. আর হোয়ের্নল, এবং পরবর্তীকালে ভিনসেন্ট স্মিথ, আর. কে. মুখার্জী, ডি.সি.সরকার, আর.সি.মজুমদার, এ.এস. আলতেকার এবং পি.এল. গুপ্ত প্রমুখ। তবে এদের বর্ণনায় সম্পূর্ণভাবে সঠিক তা ও বলা চলে না। তবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মেহেরৌলি লেখতে বর্ণিত রাজা চন্দ্রের যে সামরিক কার্যাবলী এবং অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে তা বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি হল:

১) রাজা চন্দ্র বঙ্গে তার শত্রুদের ঐক্যবদ্ধ জোটকে পরাজিত করেছিল।

২) সিন্দুতের সাতটি মুখ অতিক্রম করে বাহ্লীকদেশ জয় করেছিলেন।

৩) নিজ বাহুবলে রাজা চন্দ্র নিজস্ব সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল ভোগ করেছিলেন।

৪) তিনি ছিলেন একজন বৈষ্ণব এবং লৌহ স্তম্ভটি দেবতা বিষ্ণুর সম্মানার্থেই স্থাপিত হয়েছিল।

৫) তার ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির ধরুন দক্ষিণে সমুদ্র আন্দোলিত হয়েছিল। বঙ্গের ঐক্যবদ্ধ শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং তাতে সাফল্য লাভ করেন। রাজা চন্দ্র প্রসঙ্গে ঐ লিপিতে তা গুপ্ত শাসক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে তাঁরা একমত পোষণ করেছেন।

২২) কিংবদন্তির বিক্রমাদিত্য: কিংবদন্তির বিক্রমাদিত্যকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে অনেকেই কিংবদন্তির বিক্রমাদিত্য বলে মনে করেন। কিংবদন্তির বিক্রমাদিত্যের উপাধি ছিল "শকারি", কেননা শকরা তাঁর রাজ্য আক্রমণের সময়ে, তিনি শকদের পরাজিত করে শকারি অভিধা ধারণ করেছিলেন। এছাড়াও "বিক্রমশীল" ও "সাহসাঙ্ক" উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবার শকদের পরাজয়ের ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একটি অব্দ বা সম্বত প্রচলন করেছিলেন যা ইতিহাসে "বিক্রম সম্বত" নামে পরিচিত। জ্যোতির্বিদ্যাভরণে বলা হয়েছে বিক্রমাদিত্যের রাজ দরবারে বিভিন্ন কবি, লেখক ও পন্ডিতদের সমন্বয় ঘটেছিল এবং এই সমন্বিত পণ্ডিতদেরকে বলা হতো "নবরত্ন"। এই নবরত্ন বা ন'জন রত্নরা হলেন- ক্ষপর্ণক, অমর সিংহ, ধন্বন্তরি, শঙ্কু, ঘটকর্পর, বেতালভট্র, কালিদাস, বিখ্যাত বরাহমিহির এবং বররুচি। তিনি বিক্রম সম্বত প্রবর্তন করেন। মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক হলেও অন্য সকল রত্নরা তাঁর সময় কখনো জীবিত ছিলেন না। যেহেতু বিক্রম সম্বত ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রবর্তিত হয় কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মানুষ ছিলেন। ডঃ আর.সি.মজুমদারের মতে, বিক্রম সম্বত ও রাজা বিক্রমাদিত্যর যথার্থ পরিচয় ভারতের ইতিহাসে এটি একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন বলে আখ্যা দিয়েছেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে বিক্রমাদিত্যের একটি সম্মানসূচক উপাধিতে পরিণত হন এবং ভারতের ইতিহাসে কমপক্ষে ১৪ জন বিক্রমাদিত্য এর সন্ধান পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও বলতে হয়েছে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের কাহিনী সংযুক্ত করা তার জনপ্রিয়তায় সাক্ষ্য গ্রহণ করে।

কিন্তু অন্যদিকে ঐতিহাসিক ডি.আর. ভান্ডারকার ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এক প্রকাশিত তাঁর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। এর পরবর্তীকালে এ.বি. কীথ , ভিনসেন্ট স্মিথ সহ- কিছু ঐতিহাসিক এই মতকে সমর্থন করেন। এ ঐতিহাসিকদের তত্ত্বের পেছনে যুক্তিগুলি হল:- ১) এখানে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারত জয় করেছিলেন এবং শকদের বিতাড়িত করেছিলেন এ ঘটনা ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য। সুতরাং এই দিক থেকেই বিচার করলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে তাঁর নামের সঙ্গে "শকারি" বা "শকদের শত্রু" অভিধা যুক্ত হওয়ার যৌক্তিকতা আছে। ২) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মালব জয় করেছিলেন। এই কারণে ৫৮-৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এ প্রবর্তিত বিক্রম বা মালব সম্বতের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। ৩) শকদের কাছ থেকে উজ্জয়িনী জয় করার পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে পরিণত হয়েছিল উজ্জয়িনী। ৪) কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ দরবারে অলংকৃত একজন খ্যাতনামা কবি এর রচনা থেকে গুপ্ত যুগের গৌরব ও ঐতিহ্য প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ৫) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিধা খ্যাতনামা ব্যক্তি।

আবার অনেকের মতে, রাজা বিক্রমাদিত্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে সোমদেবের কথাসরিৎসাগর এবং ক্ষেমেন্দ্রর বৃহৎ কথা মঞ্জুরীতে। এই উভয়ে লেখক ছিলেন কাশ্মীর পন্ডিত এবং এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে। অন্যদিকে জ্যোতির্বিদ্যামূলক গ্রন্থ জ্যোতির্বিদ্যাভরণ এবং জৈন গ্রন্থ প্রভাকরচরিত ও কালকাচার্য- কথানক থেকে এ ব্যাপারে কিছু বিষয় পেয়ে থাকি। কিন্তু এই সাহিত্যিক উপাদানগুলি ছিল গুপ্ত যুগের অনেক পরে রচনা করা হয়েছিল। এগুলি কাহিনীর উৎস কেবলমাত্র সাহিত্যিক উপাদান কিন্তু কোন শিলালৈখিক বা মুদ্রাগত থেকে প্রামাণ্য নয়।

২৩) শক যুদ্ধের ফলাফল: এই যুদ্ধ নানান দিক থেকে সুদূরপ্রসারী। শক-ক্ষত্রপদের শেষতম মুদ্রা ৩৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেছে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শক চিহ্নিত মুদ্রার তারিখ হল ৪০২ খ্রিষ্টাব্দ। ৩৮৮- ৪০২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় চন্দ্রগুপ্ত শক্তিকে পরাস্ত করেন। ১) শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভের ফলে এই অঞ্চলের উপর থেকে প্রায় চারশো বছরের বিদেশি শাসন অবসান ঘটে। ২) বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়। এ অঞ্চলে উজ্জয়িনী নগরীতে তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ৩) এর ফলে সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বলে অনেকে মনে করেন। ৪) পশ্চিম উপকূলের বন্দর গুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পথ প্রশস্ত হয়। ৫) পশ্চিম উপকূলের বিখ্যাত ভৃগকচ্ছ বা বারিগাজা বন্দর গুপ্ত অধিকারী চলে আসে। এই বন্দর থেকে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের প্রগত বাণিজ্য চলতো । রোম, বাইজান্টিয়াম প্রভৃতি রোমান নগরীতে ভারতীয় রেশনের কাপড় খুব চাহিদা ছিল। তাছাড়া চীনের রেশম ভারতের পথ ধরে এই বন্দর হয়ে রুমে রপ্তানি হয়। ৬) এই ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে উজ্জয়িনী নগরীর গুরুত্ব বাড়ে এবং এটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত হয়।

২৪) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতা সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি সাম্রাজ্যের অধিকার পেয়েছিলেন। তিনি ও রাজ্য জয়ের প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর সময়ে রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি শক-ক্ষত্রপদের পরাজিত করে তাঁদের রাজ্য নিজ আয়ত্তে এনেছিলেন। বঙ্গ ও বাহ্লীক রাজ্য জয় করেছিলেন। তাছাড়া সুস্থ শাসন ব্যবস্থা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প-স্থাপত্যর বিকাশ, রাজ্যের

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিকাশ এবং ধর্মক্ষেত্রে তিনি আপ্রাণ প্রয়াসী ছিলেন। সুতরাং এই দিক থেকে বিচার করলে তাঁর যুগকে ও " সুবর্ণ যুগ" বলা যায়।

মূল্যায়ন : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতা সমুদ্রগুপ্তের পর উত্তরাধিকারী সূত্রে যে গুপ্ত বংশের সিংহাসনে বসেছিলেন, তাঁর কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রবৃত্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে তিনি প্রচুর খ্যাতনামা অর্জন করেছিলেন। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন, সমুদ্রগুপ্ত শুধুমাত্র তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য রাজ্য জয় করেছিলেন। তাঁর আমলে রাজত্বের পাশাপাশি সাহিত্যিক, সংস্কৃতিক এবং বিভিন্ন কর্মশালায় অত্যন্ত প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তিনি যে শুধু দক্ষ শাসক ছিলেন তা নয়, তিনি এক উচ্চ মানের ব্যক্তিত্ব ও ছিলেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাকল্যাণ মূলক কাজও করেছিলেন। এস.আর.গয়াল এর মতে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিমীয় শক, ক্ষত্রপদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। মালবকে নিজ আয়ত্তে আনেন। তাই এই সব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও মৌর্য সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজাদের মতো বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি:

1) সিনহা গোপাল চন্দ্র- ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ, প্রথম খন্ড) , প্রকাশনা- প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স - সংযোজিত ও পরিমার্জিত সপ্তম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ২০১৯, পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, পৃ-৬০৪-৬১২,৬১৫,৬৬৫-৬৭১,৬৭৯,৬৮১-৬৮৪,৬৮৬-৬৮৮, ৬৯০-৯১.
2) মাইতি, প্রভাতাংশু এবং মন্ডল, অসিত কুমার- ভারত ইতিহাস পরিক্রমা [প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ - ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ] (প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রভাতাংশু মাইতি পৃ-৪১৮ - ৪২৩, ৪২৭-৪৩০, ৪৪৪-৪৫৩.
3) ভারতের ইতিহাস [প্রাগৈতিহাসিক যুগ - ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ] পুনর্মুদিত সেপ্টেম্বর - ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ] - জীবন মুখোপাধ্যায় , পৃষ্ঠা নং- ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫.
4) ভারতের প্রাচীন অতীত- রামশরণ শর্মা, (প্রথম প্রকাশ ২০১১), ISBN-978-81-250-4269-3, পৃ-২৩৬, ২৩৮, ২৩৯.
5) Ancient India by V.D. Mahajan, ISBN: 81-219-0887-6 , Code :- 13 004, পৃ- ৪৬৮-৪৭১, ৪৯৪-৫০০, ৫০৩-৫০৪.
6) Banerjee, R.D.: The age of imperial Guptas, (Archaeological survey of India), Accession No- 17110, p- 26, 27,28, 31,32, 33, 34, 35.
7) The history of ancient early medieval India, (second edition) from the stone age to the 12 century , Upinder Singh, ISBN: 978- 93-570- 5148- 4, p-571, 572.
8) Google Coinindia.com (galleries Chandragupta II).
9) Sachindra Kumar Maity: The imperial Guptas and their times (300-500 AD). P-83, 89, 90.